দীর্ঘ ৯ বছর পর কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

দীর্ঘ ৯ বছর পর কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে ৩টি বুথে ভোট গ্রহন করা হয়। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২।

অভিবাবক সদস্য পদে মোট ৫জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে মোমেন আল আরাফাত সোহেল ৪১১ ভোট পেয়ে ১ম, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান ৩৪৬ ভোট পেয়ে ২য়, মফিজুর রহমান ২৯২ ভোট পেয়ে ৩য়, ও সাইফুর রহমান মিন্টু ২৬০ ভোট পেয়ে ৪র্থ হয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে কোন প্রার্থী না থাকায় মোছাঃ রিপনা থাতুন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। দীর্ঘ দিন পর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে উৎসবের আমেজ ছিল।

তাঁরা মনে করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শিক্ষার মান উন্নয়নসহ সুষ্ঠু সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবেন। নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া।

মেহেরপুরে সাবেক ছাত্রনেতাদের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসকে স্বাধীনতা পদক সম্মানে ভূষিত ও মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় খসড়া

অনুমোদন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি আনন্দ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিকালে আনন্দ মিছিলটি মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে শুরু করে বড়বাজার থেকে প্রধান সড়ক হয়ে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সহ প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

বাদ্য বাজিয়ে জাতীয় পতাকা সহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের ছবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

পরে শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বক্তব্য রাখেন।

আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাফুয়ান আহমেদ রূপক, বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, গাংনী উপজেলা যুব লীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, মুজিবনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদু,সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরণ, সাংস্কৃতিক কর্মী শাশ্বত নিপ্পন চক্রবর্তী, ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান সহ সাবেক এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করে।

টিক্কা খানের কলমাছানি

মার্চ ১৯৭১। পরিস্থিতি বদলে গেল ১ তারিখেই। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। এদিন দুপুরে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে বাংলা এবং উর্দুতে প্রচার হল তার অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা। সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। ঢাকা পরিণত হল বিক্ষোভের নগরীতে। হোটেল পূর্বাণীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বৈঠকে বসল আওয়ামী লীগের পার্লমেন্টারি পার্টি। সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদ জানালেন এবং ২ মার্চ ঢাকায়, ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। মেহেরপুরে ১ মার্চ সন্ধ্যায় বিবিসির খবরে ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর্যালোচনা এবং বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচির খবর জানা গেল। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বসলেন বৈঠকে। সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত এমএনএ (এমপি) মোঃ ছহিউদ্দিনের হাতে তখন মেহেরপুরের নেতৃত্ব। তাঁর বাড়িতেই হলো বৈঠক। এতে যোগ দিলেন মেহেরপুর মহকুমা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারাও। রাতেই তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল করেন ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে। এদিন থেকে মার্চের প্রতিটি দিনই মেহেরপুর ছিল বিক্ষোভে উত্তাল। এর রেশ ছিল ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথ তলায় মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণের দিন পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি , সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউ্◌িদন আহমদকে প্রধানমমন্ত্রী কেওর মুজিনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল। ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মেহেরপুর ছিল মুক্তাঞ্চল। যার ফলে এখানকার মানুষ তাদের যুদ্ধ কৌশল বেশি দেখা ও দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। মেহেরপুরের সীমান্তপথ দূর- দুরান্তের মানুষের জন্য নিরাপদ রুট।

১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দখল নিয়েছিল মেহেরপুরের। আর তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর। তাদের হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগের বর্বরতায় অনেক মূল্য দিতে হয় মেহেরপুরবাসীকে। তারপরও দেশ-মাকে মুক্ত করতে তাঁরা কখনও পিছপা হননি। বরং অন্যান্য এলাকার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধে মেহেরপুরবাসীর অবদান বেশিই। ১৯৭১-এর মার্চ-এপ্রিলের, বিশেষ করে মার্চের ঘটনাবলীর দিকেই এ লেখায় প্রধানত দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করি।

২ মার্চ ১৯৭১ মেহেরপুর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশাল মিছিল

মেহেরপুরের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আগে থেকেই ডামি রাইফেল দিয়ে অস্ত্রচালনার ট্রেনিং দেয়া হয়। মেহেরপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে আমরা যারা স্কাউট করতাম তাদেরকে স্কুলে থাকা ডামি রাইফেল দিয়ে অস্ত্রচালনা শেখানো হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধে কলেজ ছাত্রদের নেতৃত্বে এসময় গড়ে তোলা হয়েছিল বন্দুকবাহিনী। ছাত্র-যুবক যিনি যেভাবে পেরেছেন, তিনি সেভাবে তাঁর প্রিয় মেহেরপুরকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। পাকিস্তানিরা যাতে মেহেরপুর প্রবেশ না করতে পারে সেজন্য ২৬ মার্চের পর থেকে খলিসাকুণ্ড সেতুতে প্রতিরোধব্যুহ গড়ে তোলা হয়। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে গাছ কেটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আসার পথ রুদ্ধ করা হয়। এক পর্যায়ে গ্রামে ও ভারতে যেতে বাধ্য হতে হয় মেহেরপুর শহরের সিংহভাগ মানুষকে। মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসের সাথে লড়েছেন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে এবং বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন।

৩০ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে কুষ্টিয়া প্রতিরোধযুদ্ধে মেহেরপুরের আনসার-মুজাহিদ বাহিনীর দুই শতাধিক সদস্য অংশ নেন। এই যুদ্ধে আনসার-মুজাহিদদের সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিজয় ছিল প্রথম বিজয়। বিখ্যাত টাইম পত্রিকা এ যুদ্ধে বিজয়গাঁথা তুলে ধরে প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিল, যার শিরোনাম ছিল ‘ব্যাটল অব কুষ্টিয়া’।

সে সময় মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন ও অস্ত্র চেয়ে পাঠান। থ্রিনট-থ্রি’র জায়গায় উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যন্য সহায়তা দিয়েছিল ভারত ও রাশিয়া। ভারত এদেশের কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল।
ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খানরা মেহেরপুরসহ বৃহত্ত কুষ্টির মাটিকে ‘তামা’ কেও দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু তাদের শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এর ফলে এদেশের মানুষ কার্যত তাদের ‘কলমাছানিই’ কেও ছেড়েছে।
বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়িঁয়েছে। এখন এই দেশকে আরও এগিয়ে নিতে হবে।

লেখক: কবি ও সাংবাদিক, ঢাকা।

বঙ্গমাতা, আমাদের অনিঃশেষ প্রেরণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার আর তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন তাঁর সক্রিয় সহকর্মী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক মহীয়সী নারী। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন: “রেণুর (ফজিলাতুন্নেছার ডাক নাম) বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, ‘তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।’ রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। …রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিনবছর হবে।”

শেখ মুজিবুর রহমানদের বাড়ি আর বেগম ফজিলাতুন্নেছাদের বাড়ি ছিল একেবারে লাগালাগি। রেণুর বাবার মৃত্যুর পর পাঁচ বছর বয়সে মা এবং সাত বছর বয়সে দাদা মারা গেলে মাথার ওপর থাকে কেবল শ্বশুর বাড়ির পরিবার। এরপর তাই তাকে শ্বশুর বাড়ি চলে আসতে হয়। রেণুর শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুর মাতা সায়েরা খাতুন তাঁকে নিজের সন্তানদের মতো মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বলছেন, “আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়।”

যখন তুখোড় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের টাকার প্রয়োজন হত তখন তিনি ছুটে যেতেন পরিবারে। বাবা-মা-বোন-রেণু কারো না কারো কাছে তিনি হাত পেতে কখনই নিরাশ হতেন না। আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বলছেন, “…সময় সময় রেণুও আমাকে কিছু টাকা দিত। কোনোদিন আপত্তি করে নাই, নিজে মোটেই খরচ করত না। গ্রামের বাড়িতে থাকত, আমার জন্যই রাখত।” পরে বঙ্গবন্ধু বার বার কারারুদ্ধ হলে বেগম মুজিব বিনা দ্বিধায় গৃহ-সামগ্রী ও নিজের অলংকার বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করেছেন।

বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রথমে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ও

অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা, তার পেছনেও বঙ্গমাতার অবদান আছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, ‘আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, ‘বসেই তো আছো, লেখো তোমার জীবনের কাহিনি।’ বললাম, ‘লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলো জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।’
‘…আমার স্ত্রী যার ডাকনাম রেণু- আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কটা আমাকে দিয়েছিল। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।’

জয়ার চন্দ্রাভিযান

বনপোড়া হরিণের কি পুব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞান থাকে! আত্মরক্ষার জন্যে সে কেবলই দৌড়োয়, ডান থেকে বামে, আবার বাম থেকে ডানে। বাঁচাটাই মুখ্য। বাঁচার জন্যেই দৌড়নো। জোড়পুকুরের গণহত্যার শিকার সেদিনের তাড়া খাওয়া অসহায় মানুষগুলো চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, বাগান-পুকুর জমিজিরেত সব কিছু পেছনে ফেলে ছুটে চলেছিল পশ্চিমে। হ্যাঁ, পশ্চিমেই প্রাণের নিরাপত্তা। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে গত দেড় মাস ধরে কত মানুষ যে খালবিল নদীনালা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পশ্চিমে গেল, দূর দূরান্তের সেই সব বাস্তুচ্যুত মানুষের পরিসংখ্যান কে রাখে! তবে তাদের গন্তব্য ঠিক পশ্চিমে। কী আছে পশ্চিমে! পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাঙালির বাস। তারাও মাকে মা বলে, বাবাকে বাবা। একই মাটি মাঠের সবুজ, বনবনানী পশুপাখি, একই রকম জীবনধারা। তবু পৃথক দুই রাষ্ট্রের বাসিন্দা দুই রকমের পরিচয়। তবু মরা নদীর ধারার মতো শুষ্কপ্রায় সম্পর্কও আছে দু’পারের মধ্যে। সবার না থাকুক, সীমান্তঘেঁষা এ অঞ্চলের সব গ্রামেরই কারো না কারো আত্মীয় স্বজনও আছে পশ্চিমবঙ্গে। যুদ্ধের উত্তাপ এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে সেই তাড়া খাওয়া দুঃসময়ে আত্মীয় অনাত্মীয়ের ভেদরেখা সহজেই আড়াল হয়ে যায়। আত্মীয়ের ভরসায় নয়, স্রেফ প্রাণের তাগিদে বহু দূর দূরান্তের এই সব ভিটেমাটিহারা মানুষেরা প্রতিদিনই দুর্গম

কাদাপাঁকের পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে চলেছে পশ্চিমে।

পশ্চিমে কোথায়, কোন গ্রামে? না তারও কোনো ঠিক ঠিকানা জানা নেই। সীমান্তবর্তী গাংনী থানার একেবারে পশ্চিমের যে কোনো গ্রামের মধ্য দিয়ে অনায়াসে পৌঁছুনো যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, শুধু এইটুকু তথ্য জানে পিঁপড়ের সারির মতো চলমান দেশত্যাগী মানুষেরা। সামান্য এই জানাটুকুর উপরে ভরসা করে অজানা-অচেনা গন্তব্যে পা বাড়িয়েছে শত শত নারী পুরুষ। অক্ষম বৃদ্ধ, অসহায় শিশু, গর্ভবতী মা — কারো ক্ষমা নেই;যতক্ষণ পারো নিরুদ্দিষ্ট এই মানবমিছিলে চলতে থাকো, পিছিয়ে পড়লেই হারিয়ে যাওয়া। পেছনে তাকাবার সময় কারো নেই।

এ এক বিচিত্র মানবপ্রবাহ। খুব যে সুসংগঠিত এবং সুসংবদ্ধ, তাও বলা যাবে না। হিন্দুপ্রধান এলাকার বিভিন্ন গ্রামের গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষ। পাকিস্তানি আর্মি এবং তাদের এ দেশীয় দোসরেরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা গ্রামে, পলায়নপর মানুষকে সামনে পেলেই হত্যা করেছে নির্বিচারে, লুট করেছে সোনাদানা সহায় সম্পদ; তারপরও মানুষ বাঁচতে চায়, শুধু প্রাণ নিয়ে বাঁচতে চায়। জন্মভিটে ছেড়ে মানুষ বাঁচে কী করে সে বিদ্যে কারো জানা ছিল না। সদ্যমৃত বাবার মরদেহ ফেলে রেখে, হায়েনার হাতে সম্ভ্রমহারা বোনকে ছেড়ে, সংজ্ঞাহারা বৃদ্ধা মাকে ঝুড়িতে বসিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে টেনে টেনে পাড়ি দিয়ে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এ কোন বাঁচা, কে জানে!

মৃত্যুর চোখ রাঙানিকে পিছে ফেলে মানুষ তবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে। পথে পথে কত দুর্বিপাক, কত না বিড়ম্বনা, তবু বেঁচে থাকার কী যে এক দুর্নিবার মোহ!

সারাদিন হেঁটে হেঁটে পায়ের পাতা ফুলে ঢোল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা- ক্লান্তিতে সারা শরীর অবসন্ন, তবু যেতে হবে পশ্চিমে । দিনের শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে অন্ধকার দৈত্য এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। তখন কী করে ঘরছাড়া মানুষের দল! পথের পাশে কোনো খড়ের চালা অথবা কারো খোলা বৈঠকখানায় রাত্রিযাপনের জন্যে মাথা গোঁজে। কেউবা আরো কয়েক পা এগিয়ে প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেয়। কোথাও দু’হাত জায়গা খালি নেই, মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। আলমডাঙার গোবিন্দপুর থেকে আসা দলটি আগেভাগে
স্কুলঘরের দখল নিয়েছে। ফলে পরে আসা লোকজনের পক্ষে স্থান সংকুলান কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু ফরিদপুরের পাংশা থেকে আসা দলের সদস্য

মধ্যবয়সী এক গর্ভবতী নারী আর কিছুতেই ভার বইতে পারছে না। কখন কী ঘটে যায়, বলা মুশকিল। তার জন্যে স্কুলঘরের এক বারান্দায় কাপড় টানিয়ে তাৎক্ষণিক এক আঁতুড়ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। সেই ঘেরা স্থানে প্রসূতি ঢোকার পরপরই নবজাতকের ট্যাঁ ধ্বনি শোনা যায়।

বাইরে তখন বারোয়ারি খিঁচুড়ি বিতরণ শুরু হয়েছে। এ গ্রামেরই কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক সপ্তাহ খানেক থেকে এ উদ্যোগ নিয়েছে। তার পেছনেও বিশেষ এক কারণ আছে। দুঃসময়ে মানুষের পাশে মানুষই দাঁড়ায়, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ; আবার এই দুঃসময়কে পুঁজি করে দুর্গত মানুষের সর্বনাশ করার মতো অমানুষেরও তো অভাব নেই। দূরাঞ্চলের অসংখ্য মানুষ প্রায় প্রতিদিনই মাথায় টিনের সুটকেস, কাপড়ের পোটলা,

শেষ সম্বল সোনাদানা হাতের মুঠোয় নিয়ে এ গ্রাম্য কাদাপাঁকের রাস্তা ধরে পশ্চিমে যাচ্ছে, পথিমধ্যে কোথাও রাত্রি যাপন করে ভোরের আলো ফোটার আগেই আবারও রওনা হচ্ছে দুরু দুরু বুকে; কোনো রকমে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই তারা বাঁচে। কিন্তু বাঁচা ব্যাপারটা কি এতই সহজ! গ্রাম্য কিছু দুর্বৃত্ত এসে পথ আগলে দাঁড়ায়, কেড়ে নেয় দেশত্যাগী অসহায় মানুষের সর্বস্ব। আর্মি ক্যাম্পে খবর দেবে বলে তারা ভয় দেখায়। এভাবে পরপর কয়েক দফা লুটপাটের ঘটনা ঘটলে ষোলোদাগের বেশ কিছু সাহসী মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে, রাতের আশ্রিত ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থাও করে দেয়। এরই মধ্যে নবজাতকের আগমন নতুন মাত্রা যোগ করে। কয়েকজন আমুদে স্বেচ্ছাসেবক শামু ময়রার ঘুম ভাঙিয়ে গুড়ের তৈরি মিঠাই এনে মিষ্টিমুখেরও আয়োজন করে বসে। নবজাতকের নাম রাখা হয় জয়া। ক্ষুদ্র মানবপিন্ড জয়া সে রাতে আশ্রয়কেন্দ্রের ক্লান্ত শ্রান্ত উৎকন্ঠিত মানুষ গুলোর মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। নানা জায়গা থেকে প্রাণভয়ে ছুটে আসা এতগুলো অচেনা মানুষ জয়াকে ঘিরেই পরস্পরের আত্মীয় হয়ে ওঠে সহসা।
সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি।

আকাশ নুয়ে আছে মাথার উপরে। জয়াকে নিয়ে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলে স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ততক্ষণে বৃষ্টির ধারা ঘন হয়ে এসেছে। এরই মাঝে আঁতুড়- ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে এক মহিলা ঘোষণা করে — প্রসূতির অবস্থা সুবিধার নয়, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।
সর্বনাশ! এই বৃষ্টিভেজা রাতে কী উপায় হবে!

পড়ে আলমডাঙা, হালসা, পোড়াদহ এবং সারা দেশে। ব্যাস, জায়গামতো একটুখানি টোকা দিতেই আঁচলাগা এঁড়ে গরুর মতো লাফিয়ে ওঠে পাকিস্তানি সৈন্যরা। গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে মুক্তিফৌজ ধরার চেয়ে জোড়পুকুরে একত্রে ওদের গুছিয়ে পাওয়া যাবে, এ তো বড়ই ভালো খবর। রাজাকাররা অতি উৎসাহে আরেক কাঠি এগিয়ে যায়, জোড়পুকুরের ওই পথ ধরে বিভিন্ন জায়গার শরণার্থীরাও ভারতে পাড়ি দেয় — সে কথাও সগৌরবে জানিয়ে আসে।

সেদিন প্রভাতবেলা নতুন দিনের সূর্য এসে বৃষ্টিধোয়া আকাশের গায়ে রক্তিম আবীর মাখিয়ে দেবার আগেই রক্তের হোলিখেলা শুরু হয়ে যায় জোড়পুকুরে। প্রধান সড়কের দু’পাশের গর্তে খানাখন্দে দেশত্যাগে উদ্যত নরনারীর রক্ত জমে ওঠে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ছাপিয়ে মুমূর্ষু মানুষের আহাজারি আর শেষ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকুল শিকার যখন হাতের কাছে প্রস্তুত, শিকারী বিলম্ব করবে কেন? বামন্দি ক্যাম্প থেকে গাড়ি ভর্তি হয়ে যমদূতেরা জোড়পুকুরের নির্দিষ্ট অবস্থানের দিকে বেপরোয়া গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসে, তারপর ব্রাশফায়ার। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রুপের জনা তিরিশেক মানুষ প্রধান সড়ক পেরিয়ে ঢালুতে নামতে না নামতেই শুরু হয় বিরামহীন গুলি বর্ষণ। জল্লাদেরা কোথাও প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট রাখতে চায়নি। সত্যিকারের কথায় সেদিনের এ গণহত্যায় ঠিক কতজন শহিদ হয়, সে হিসেব আদৌ কোনোদিন করা হয়ে ওঠেনি, হয়তো আর হবেও না কখনো। তবে এই বাংলার মাঠঘাট সবুজ প্রান্তর খুব জানে, ভালোই জানে– তারা সবাই বাঁচতে চেয়েছিল।

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের পরের আশ্চর্যটি হচ্ছে এই যে এমন ভয়াবহ মৃত্যু প্রবাহ কিন্তু সে রাতে ভূমিষ্ঠ জয়াকে গ্রাস করতে পারেনি। অভিজ্ঞ ধাত্রী আম্বিয়ার মা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দিয়েও যখন রক্তক্ষরণের রুগি বাঁচাতে পারেনি, তখন সদ্যোজাত শিশুটির কচি কোমল কণ্ঠের চিৎকারধ্বনি তাকে আকুল করে তোলে। জয়ার মায়ের সিঁদুর রাঙা মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে তখন সে জয়াকেই পরম মমতায় কোলে তুলে নেয়। ওইটুকু শিশু কী ভেবে কান্না থামিয়ে তার রক্তাভ চোখের পাতা পিটপিট করে ওঠে। বৃষ্টি ধোয়া আকাশের এক কোনে তখন দ্বিতীয়া কিংবা তৃতীয়ার স্বল্পায়ু চাঁদ ম্লান ঠোঁটে দিব্যি হেসে ওঠে অম্লান।

এগিয়ে যাক মেহেরপুর প্রতিদিন

মেহেরপুর তথা বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ অঞ্চলের জনপ্রিয় সংবাদপত্র দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন গত ২৬ মার্চ-২২ ৫ম বছরে পদার্পণ করেছে। এই শুভ মুহূর্তে আমি পত্রিকার প্রকাশক এম.এ.এস ইমন,সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দুসহ কর্মরত সকল সাংবাদিক -কর্মকর্তাবৃন্দ,পাঠক, শুভানুধ্যায়ী,বিজ্ঞাপনদাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মেহেরপুরের মতো একটি অবহেলিত অঞ্চল থেকে একটি চমৎকার দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত করার জন্য তারা আবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। মেহেরপুরবাসীর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রাণের পত্রিকা হয়ে উঠেছে। আমি এই পত্রিকার সফলতা কামনা করি। আশা করি পত্রিকাটি নিয়মিত বের হবে এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে।

মেহেরপুরে অনেক নেতা ও শিল্পপতি রয়েছেন, কিন্তু সাহস করে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ছোট ভাই এম.এ.এস ইমন সেই সাহস দেখিয়েছেন এবং নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশ করে আসছেন। এজন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। পত্রিকাটির নিউজ,মেকাপ ও ফিচারগুলো সুন্দর। পত্রিকাটিতে আমি নিয়মিত লেখার চেষ্টা করি। তারাও আমার লেখাগুলো চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে। মাহাবুবুল হক পোলেন পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলো। পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দু উপস্থাপিত মক্তকথা অনুষ্ঠানটি সাম্প্রতিককালে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমি নিজেও একাধিকবার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। মেহেরপুরে গেলে সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দুর সাথে দেখা করার চেষ্টা করি। অনলাইনে আমি নিয়মিত এই পত্রিকাটি পড়ি। বেশ ভালো লাগে।

প্রকৃতপক্ষে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের আগে মেহেরপুরে নিয়মিত কোন পত্রিকা কখনও ছিল না। অতীতে যেগুলো প্রকাশ হয়েছে, সেগুলো হঠাৎ হঠাৎ এবং তা বন্ধও হয়েছে হঠাৎ হঠাৎ। সে ক্ষেত্রে প্রকাশনা অব্যাহত মেহেরপুর প্রতিদিন তাদের ব্যতিক্রমী অবস্থান বজায় রেখে চলেছে।এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

১৯৮৫ সালে এসএম তোজাম্মেল আযমের সম্পাদনায় পরিচয় নামে একটি সাপ্তাহিক মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়কের গফুর প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হতো। তোজাম্মেল আমার বন্ধু মানুষ। তার অনুরোধে আমি মেহেরপুর নিয়ে অনেক লিখেছি এই পত্রিকায়। ১৯৯২ সালের মার্চ থেকে দৈনিক আযম নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এসএম তোজাম্মেল আযমের সম্পাদনায়। এ পত্রিকাটির প্রকাশনা ছিল অনিয়মিত।

১৯৮৬ সালের ২৬শে মার্চ মেহেরপুর কোর্ট রোডের লুমা প্রিন্টিং প্রেস থেকে সাপ্তাহিক চুম্বক প্রকাশিত হয়। প্রায় এক বছর নিয়মিত প্রকাশনার পর সরকারের নির্দেশে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার সম্পাদকও প্রকাশক ছিলেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ আমিনুল ইসলাম।

১৯৮৮ সালের ১১ই জুলাই মেহেরপুর কোর্ট রোডের লুমা প্রিন্টিং প্রেস থেকে সাপ্তাহিক মুজিবনগর প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অ্যাডভোকেট সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক। আমিনুল ভাই নিজের প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপতেন। এ পত্রিকাটিও পরে বন্ধ হয়ে যায়।

রুহুল কুদ্দুস টিটোর সম্পাদনায় মেহেরপুর কাঁসারীপাড়া থেকে ১৯৯২ সালের ১৪ই ফ্রেবুয়ারি পাক্ষিক পশ্চিমাঞ্চল প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ঢাকা থেকে কম্পিউটার কম্পোজে আমার দায়িত্বে প্রকাশিত হতো। নামও দিয়েছিলাম আমি। মনে পড়ে থানা কাউন্সিল হলে পত্রিকাটি প্রকাশনা উৎসব হয়েছিল। ১৯৯২ সাল থেকে অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ খানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক মেহেরপুর প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পত্রিকাটি দৈনিক মেহেরপুর নামে প্রকাশিত হয়। রশিদ হাসান খান আলো পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক। এর প্রকাশনা নিয়মিত নয়।

তরুণ সাংবাদিক এসএম মুজাহিদ আল মুন্নার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্য ভিত্তিক পত্রিকা শিকড়। পত্রিকাটি বেশ কয়েকটি সংখ্যা বের হয়।

মেহেরপুর জেলার প্রথম ও জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ। এর সম্পাদক ও প্রকাশক: পলাশ খন্দকার, বার্তা সম্পাদক: মিজানুর রহমান মিজান। ষ্টাফ রিপোর্টার সাঈদ হোসেন। অনলাইন নিউজ পোর্টালটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমি নিজেও এই অনলাইনে মেহেরপুর নিয়ে মাঝে-মধ্যে লিখি।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দীঘদিনের অবহেলিত জেলা মেহেরপুরকে

সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এবং মুজিবনগর খ্যাত ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পত্রিকাটি পাঠক মহলে ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে মেহেরপুর প্রতিদিন ৫ম বছরে পদার্পণ করলো। পত্রিকাটির বস্তুনিষ্ঠতা প্রশংসাযোগ্য। মেহেরপুরের মতো আয়তনে ছোট এবং বলা চলে প্রায় শূন্য শিল্প ও কৃষিনির্ভর এলাকা থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ অনেক কঠিন। তা সত্ত্বেও মেহেরপুর প্রতিদিন সাহসের সঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বিকশিত হতে হতে এগিয়ে চলেছে। এজন্য আমি এই পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি দীর্ঘকাল ধরে ঢাকায় আছি। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে মেহেরপুরে। মেহেরপুরের মানুষ ও মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে লিখতে চাই। আমার অনেক দিনের প্রত্যাশা ছিল মেহেরপুর থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হোক। আমার হৃদয়ের প্রত্যাশা পূরণ করায় ছোট ভাই এম.এ.এস.ইমনকে জানাই ধন্যবাদ।

কুষ্টিয়া থেকে এখন ১৪টি দৈনিক নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সাপ্তহিক পত্রিকা অসংখ্য। চুয়াডাঙ্গা থেকে দৈনিক মাথাভাঙ্গা ও পশ্চিমাঞ্চলসহ আরো কয়েকটি পত্রিকা বের হয়। সে ক্ষেত্রে মেহেরপুর অনেক পিছিয়ে ছিল। মেহেরপুর প্রতিদিন আমাদের সেই আশাকে পূরণ করেছে।

পরিশেষে বলবো,এগিয়ে যাক দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন,এগিয়ে যাক মেহেরপুরেরের সর্বস্তরের মানুষ। মেহেরপুরের উন্নয়ন হোক। ভালো থাকুক মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ অঞ্চলের মানুষ। লেখক: সাংবাদিক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী।

কলাপাতায় পদ্মপাতায় খানা খাওয়ার চল হারিয়ে গেছে

বাঙালি চিরকালই জীবনরসিক, একইসাথে ভোজনরসিকও। বাঙালির বিয়ে হোক বা বৌভাত, কব্জি ডুবিয়ে উদরপূর্তি করা এ এক বড় পুরনো প্রথা।

হতো না। প্রবীনদের মতে কলাপাতায় খাওয়ার মজাই আলাদা। জিয়াফতের ডাল-ভাত, খিচুড়ি খাওয়া আজ যেন প্রবীনদের কাছে শুধুই স্মৃতি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও এতদিন টিকে ছিলো পদ্মপাতা কিম্বা কলাপাতায় শিরনি প্রসাদ পরিবেশনের। তাও হারিয়ে যাচ্ছে।

কলাপাতা ও পদদ্মপাতায় খাওয়ানো লাভজনক ও সস্তা বিকল্পগুলোর একটি। প্রচুর মানুষকে একসঙ্গে খাওয়াতে বাড়তি খরচের বোঝা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। শুধু কলাগাছ থেকে পাতা কেটে এনে ও জলাশয় থেকে পদ্মপাতা সংগ্রহ করে পানি দিয়ে ধুয়ে খাবার সাজালেই হয়ে যায়। পাতায় খাওয়া বঙ্গ সমাজের রীতি। শুধু বঙ্গ সমাজ কেন? দক্ষিণ ভারতেও কলাপাতায় খাওয়ার প্রচলন আছে। এখনও অনেক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় পাতা। পাতায় খাবার খেলে তা থাকে রাসায়নিকমুক্ত।

একটা সময় ছিল স্বচ্ছল পরিবারের পাশাপাশি সেকালে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারেও বিয়ে, বৌভাতে ভোজের ব্যবস্থা ভালোই ছিল। চমকদারি না থাকলেও সে ভোজে আন্তরিকতার স্পর্শ থাকতো। খাওয়া হতো বাড়ির উঠানে সামিয়ানা বেঁধে। আসন, চাটাই পাতা হতো। খাওয়া হতো কলাপাতায় আর পানি দেওয়া হতো মাটির গ্লাসে।
সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। বাঙালি জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। একালের বাঙালির বিয়েতে ভাড়া বাড়িই ভরসা। আর খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব পড়ে কেটারিং এর ওপর। অর্থ-ক্ষমতার গৌরব সেকালের মতো একালেও আছে। নামি কেটারিংয়ের বিরিয়ানি, মোগলাই, চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল খানা পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দেয়া হয় অতিথিদের। অদৃশ্য হয়ে গেছে কলাপাতায় খাওয়া। দেখা যায় না আর কলাপাতা ও মাটির থালা। আসনের বদলে জায়গা করে নিয়েছে চেয়ার টেবিল অথবা বুফে। নিজেই পছন্দমতো খাবার তুলে গল্প করতে করতে দাঁড়িয়ে খাওয়া।

একালে বিয়ে বাড়ির বুফেতে সাজানো থাকে হরেক রকমের রঙবেরঙের স্যালাড। আর দেখা যায় না সেই সব ‘খাইয়ে মানুষদের’। যারা বিশখানা মাছের টুকরো, কেজিখানেক গোসতো বা পঞ্চাশটা রসগোল্লা অনায়াসে খেয়ে নিতেন বিনা ক্লান্তিতে। তাঁরাও হারিয়ে গিয়েছেন সেকালের বিয়ের ভোজের মতো। এখনকার অনুষ্ঠানগুলোতে বয়োবৃদ্ধরা কোন দাওয়াতে আনন্দের সাথে কিছুটা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। তাদের মনের স্মৃতির কুঠুরিতে আজো উঁকি দেয় বিয়ের সেসব দিনের ইতিকথা।

তথ্যসহায়ক: আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্রাচার্যের চিরঞ্জীব বনৌষধি
এবং

তোজাম্মেল আযমের মেহেরপুরের সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য।
লেখক: বাসস ও সংবাদ প্রতিদিন, মেহেরপুর প্রতিনিধি

গণতন্ত্রের কতটুকু মুল্যয়ন হলো

স্বাধিনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশে গণতন্ত্র দেশের মানুষ ও রাজনৈতিক দলের কাছে কতটুকু মুল্যায়িত হলো এ নিয়ে দিনে দিনে সংশয় প্রকোট হচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার কতটুকুই বা গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারনা রাখে। গণন্ত্রকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বিই বা কারা পালন করবে। এসব প্রশ্ন দেশের গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রচার হচ্ছে। টেলিভিশন খুললে টকশোতে গলাফাটিয়ে সুশিল সমাজের প্রতিনিধিরা প্রতিদিন বলে চলেছেন।

গণতন্ত্র’ শব্দের উৎপত্তি গ্রীক ভাষায় ডেমোক্র্যাটিয়া থেকে। এর অর্থ, ‘জনগণের দ্বারা শাসন।’ এটি দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দকে একত্রিত করেছে: ‘ডেমো(উবসড়)’ অর্থ একটি নির্দিষ্ট নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী সমগ্র নাগরিক এবং ‘ক্র্যাটোস(কৎধঃড়ং)’ অর্থ ক্ষমতা বা শাসন। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিছু গ্রীক নগর-রাজ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্র সৃষ্টি হয় গ্রিসের একটি শহর-রাষ্ট্র এথেন্সে। গণতন্ত্রের জনক বলা হয় এরিষ্টটলকে। তবে, আধুনিক গণতন্ত্রের জনক হলেন জন লক।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গণতন্ত্র শব্দের অর্থ শুধুমাত্র একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন ও নাগরিকদের ভোটের অধিকার। যাতে করে তারা আবার ক্ষমতায় আসতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে গণতন্ত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা বলবে। খাদ্য, বাসস্থান, কর্ম, নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র এসব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা। গণতন্ত্র এমন একটি শব্দ যা যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক চিন্তা জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্র কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন বা কর্তৃত্ব। গণতন্ত্র এমন

দরিদ্র জনগোষ্ঠির মানুষ সামান্য তেল ডাল চিনির জন্য ঝুলে পড়ে। সেখানে মানুষের অধিকার প্রাপ্যতা নিয়ে দোলাচাল চলতে দেখা যায়। দেশের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা খুব গর্ব করে গণমাধ্যমে বলেন মানুষের আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো। তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষ অশহায় হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতি গড়ে উঠতে পারেনি নানা কারণে। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার পথে বিচিত্র বাধা। একদিন এ দেশে সামন্ততন্ত্র ছিল। জমিদার ও জমিদারের ছেলেমেয়েরাই ছিলেন তাঁদের এলাকার প্রভু। গণতন্ত্রের যুগে নতুন সামন্ততন্ত্র শুরু হয়েছে পরিবারতন্ত্রের প্রথার মাধ্যমে। আগে ছিল জমিদারের পরিবার, এখন নেতার পরিবার।

রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের কথা বলা হয় জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে যে পরিবারতান্ত্রিক কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে পরিবারতন্ত্রের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে আছে। এই পরিবারতান্ত্রিক প্রথার জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশের দুটি বড় শাসক দল। তাদের দলের কোনো সাংসদ মারা গেলে উপনির্বাচনে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাকে ওই আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়। যাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হয় তাঁদের যোগ্যতা থাক বা না থাক। ওই আসনে দলের আর কেউ যদি প্রার্থী হওয়ার স্পর্ধা দেখান, তবে তাঁর বিপদের শেষ নেই। তার ফলে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হচ্ছে।

লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ ভাষায় রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ না থাকায় তারা রয়েছে অন্ধকারে ও হতাশায়। কোনো এলাকার কোনো দলের প্রার্থীর নাম অনানুষ্ঠানিকভাবেও যদি বছরখানেক আগে ঘোষণা করা হয়, তাহলে ভোটাররা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও যোগ্যতা বিচার করে দেখার সময় পান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি। রাজনৈতিক দলের ভেতরেই যদি স্বচ্ছতা না থাকে, তাহলে জনগণের শাসন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা। সুষ্ঠু নির্বাচনের আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির গলদ দূর করার জন্যও গণতন্ত্রকামী নেতাদের উদ্যোগ নিতে হবে।

লেখক: প্রথম আলো মেহেরপুর প্রতিনিধি।

বর্তমান প্রজন্ম জানেনা আমাদের হাপু গানের কথা

লোক সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ লোকসাহিত্য। লোককাহিনী, লোকসংগীত, ভাওয়াইয়া, বিয়ের গীত, পালাগান, ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ প্রবচন লোক সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এগুলো মূলত অলিখিত সাহিত্য। পাড়াগায়ের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নরনারীর রস পিপাসা মিটানোর তাগিদেই এর সৃষ্টি। এগুলো মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে, মুখে মুখেই চলে এসেছে। এর রচয়িতারা চিরদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। আধুনিককালে এগুলোকে বইয়ের পাতায় বন্দি করা হলেও বহুকাল ধরে তা গ্রামের পথে ঘাটে নরনারীর মুখে মুখে বিচরণ করছে। মেহেরপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোক কাহিনীগুলো মূলত সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি। এগুলোতে তত্ত্ব কথা বা শিক্ষনীয় কিছু নেই। বরং স্থূল হাস্যরসসহ আদিরস বিদ্যমান। বেশিরভাগ কাহিনী বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। রাজা-রানী, জ্বিন-ভূত, রাক্ষস-খোক্ষস, সিংহ-বকরী, বোকা-পাগল, এই ধরনের অতি পরিচিত কাহিনীগুলোই লোক সাহিত্যর ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এমনই একটি লোকসাহিত্য হাপু গান। বর্তমান প্রজন্ম জানেন না বা শোনেননি হাপুগানের কথা।

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নের বরকত আলী গ্রামে গ্রামে ‘হাপু গাবো পয়সা পাবো’ গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। বয়সের ভারে আর হাপু গেতে না পেরে ভিক্ষেবৃত্তিই তার জীবনজীবিকা। বর্তমানে মেহেরপুরের কোন গ্রামের কেউ আর হাপুগেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেনা। বিভিন্ন অঞ্চলে এই হাপু গান বিভিন্ন নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে এটি ‘হাপু’, ‘হাবু’ অথবা ‘হাফু’ নামে পরিচিত। তবে সর্বজনীনভাবে ‘হাপু’ নামটিই যথার্থ। ‘হা’ শব্দের অর্থ হা-অন্ন, বা হাহাকার এবং ‘পু’ শব্দের অর্থ পূরণ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদচূত্য মানুষ গান গেয়ে তাঁরা নিজেদের হাহাকার বা কষ্ট পূরণ করত, অর্থাৎ হৃতসর্বস্বের হাহাকারই এই হাপু গান।

সাধারণত দুইজন লোক একসঙ্গে এই গান গেয়ে থাকে। একজনের হাতে মদিরা বা গোপীযন্ত্র থাকে, আর একজনের হাতে ছোট একখানি লাঠি। লাঠিধারী

লোকটি গান গায় এবং তার সঙ্গী লোকটি ধুয়া ধরে। মুখে শব্দ-সহ পিঠে লাঠির আঘাত করে ওই গান গাওয়ার রীতি। ধুয়া গাবার পদ্ধতিটি একটু অদ্ভুত। এক পদ করে গান গায়, আর মুখে একপ্রকার শব্দ করে নিজের পিঠেই লাঠি দিয়ে তাল ভাজে। অবিশ্রাম লাঠি চালনার ফলে অনেকের পিঠে কালশিরা দাগ পড়ে যায়। কতকটা নমস্কারের ভঙ্গিতে লাঠিটা হাত দিয়ে ধরে থাকে। হাপু গানের মধ্যে সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরে। একই সঙ্গে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিকাঠামোর একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। ওই লোকগান বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গ’ নামক বইয়ে বলা হয়েছে- বেদে/হাপু গানের নানান উদাহরণ পাওয়া যাবে। এই গানে তাল রাখতে ঘুঙুর, খঞ্জনি আর ডাবকি ব্যবহৃত হত। দ্রুত উচ্চারনের জন্য (যাকে আজকের ভাষায় র্যাপ বলে) গানের আগে মুখে এক ধরনের শ্বাস নেওয়ার ধরণটাই হাপু গানের নিজস্ব ধারা। মহিলা আর ছোটছোট ছেলেমেয়েরা বগল বাজিয়ে, হাত দিয়ে শরীরের নানান অঙ্গে আঘাত করে বিচিত্র শব্দ তুলে, নানান অঙ্গভঙ্গীকরে গান পরিবেশন করেন ।

চিরকালের মতই মধ্যবিত্ত বিশেষজ্ঞরা হাপুকে মোটাদাগের, অশ্লীল বা অশ্রাব্যসহ নানান ধরণের উচ্চসাংস্কৃতিক অভিধা দিয়েছেন। তবুও বলা যায় হাপুর তুলনা হাপুই। তথাকথিত অশিক্ষিত-অমার্জিত জনগণই দেশের সংস্কৃতির হকদার, রক্ষাকর্তা। যে সব মানুষ এধরনের সংস্কৃতিকে মোটাদাগের, অশ্লীল বা অশ্রাব্যবলে গালি পাড়ে, তারাই নিজের দেশের সম্পদের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপণ করছেন। মুখে এক অদ্ভুত রকম আওয়াজ করে, একটা লাঠির বাড়ি পিঠে মারতে মারতে গাওয়া গানই আমাদের হাপু গান। কয়েকটা হাপুগানের নমুনা

ক) জামাই এলো কামাই করে খেতে দিব কী?
হাত বাড়িয়ে দাও গামছা মুড়কি দি।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব পাতে জল খেতে।
জ্যোষ্টি মাসে ছাতা দেব রোদে পথে যেত।
খ)হাপু রে হাপু
হাপু গেল মাঠে,
হাঁকে বাজার গেল।
আঁকুর গাছে পাকুর পাতা
রোদে ঝিলমিল করে গো,
বাবুদের আছে জোড়াকল
সে কলে পানি পাবো গো। হাটে গেলাম বাজারে গেলাম

কিনে আনলাম আদা,
আদা খেয়ে হাঁদুর বাবা হাগে গাদা গাদা । গ) কটাতে কোটিতে ঝগড়া লেগেছে
কোটি কটাকে খুব মেরেছে,
এই শুনে কোটি আত্মহত্যা করেছে।
হাপু আতা পাতা লো,
হাপু সর্ষে পাতা লো,
হাপু আম খাবি জাম খাবি,
তেঁতুল খাবি লো,
তেঁতুল খেলে প্যাট গুলোবে ছেলে হবে না, হাপু কাকে খেলে লো,
হাপু ক্যা ঝাড়নি লো,
হাপু বেদের মাকে লো
ই ডাঙাড়ে ঐ ডাঙাড়ে শালিক বস্যেছেঁ বেদের মাকে বিয়া করতে পাল্কী আস্যেছেঁ ঘ)বুড়াতে বুড়িতে লড়াই লাগ্যেঁছে
বুড়া কপালে বুড়ি পাদ্যেঁ দিয়েঁছে
হা ফুঃ কদম ফুঃ
ঙ) হাই লো বামুন দিদি
বাগদি ঠাকুরঝি
আমি কেলে গয়লার বেটার
ঠিয়ে কখন হাঁস্যেছি-
হাঁস্যেছি বেশ করেছি তর বাপের কী
যখন ছিলাম ছ‘বছরের
তখন উঠে নাই গা
এখন আমি বছর তেরো
হব ছেলের মা
মাছ ধরতে গিলাম আমি
কুঁয়ে লুদির কুলে
দেখি এ্যাক মিনসে
রসির লাগর
ডাঁড়া ফেলছে চারে
জলে নেমে জাল ছাঁকি
আর মিনসে থাকে চেঁয়ে
ভাল কেনা তুই ঢ্যামনা মিনসে থানা কেনা চেয়ে

তাকে দেখে উচএ যাব
নইক তেমন মেয়ে
মাছ ধরছি চিংড়ি চাঁদা
গচি মাগুর গাগর
কার্তিক মাসে মাছের রসে
বলবো কি বুন বলবো কিলো
আমার প্যাট হয়েঁছে ডাগর
খোসার দুম খোলাক দুম
কাঁথা চাপা দিঁয়ে মারব ঘুম।

একটা সময় হাপু গান গাইতেন বেদে, মালসহ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করা সম্প্রদায়। মেহেরপুরের আমঝুপি গ্রামের রফিকুল ইসলামের কাছে শুনেছিলাম হাপুর এই বাণি। এঁদের গানে আরও চমৎকৃত হওয়ার উপাদান রয়েছে।

এই গান কিছু গবেষকদের মতে বেদনা, দুঃখ ও হাহাকারের গান। কিন্তু কিছু গবেষকদের মতে হাবু গান মানুষের প্রতিবাদের গান। কারণ এর মধ্যে দুঃখ-বেদনার কথা থাকলেও, তার প্রতিবাদও আছে। সামাজিক সম্মান লাভ থেকে যারা বঞ্চিত , সেই সকল মানুষের এগুলো প্রতিবাদী গান। তাদের দুঃখ, কষ্ট, হাহাকার এইগুলি পূরণ করাই হল এই গানের মূল উপজীব্য। হাপু যে গায় সে নিজের পিঠে লাথি দিয়ে তাল ভাঁজে। অবিরাম পিঠে লাথি চালানোর ফলে পিঠে অনেক দাগ পড়ে যায়। কখনো কখনো কেটে যায়, কিন্তু সেই দুঃখ-কষ্ট তারা পরোয়া করে না। তারা মনে করে তাদের এই দুঃখ-কষ্ট সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের তুলনায় নগণ্য। হাবু গানের মধ্যে আছে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনের ছবি। সেগুলো দেখার-বোঝার দৃষ্টিশক্তি, বোধবুদ্ধি আমরা হারিয়ে ফেলছি।

লেখক: সাংবাদিক ও একাধিক বইয়ের লেখক।

বাঙালিসংস্কৃতি ধর্মবিরোধী

নয়, বরং ধর্মসহিষ্ণু

চিন্তানায়ক অন্নদাশঙ্কর রায় তার ‘সাংস্কৃতিক বিবর্তন’ গ্রন্থেলিখেছেন,বিশ শতকের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়া থেকে এক মুসলমান অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সংস্কৃত ছন্দের ওপর বক্তৃতা করতে। অধ্যাপক সাহেবের নাম ছিল বীর্যসুপার্থ। বীর্য মানে বীর আর সুপার্থ মানে পার্থ, অর্থাৎ অর্জুন।একজন মুসলমানের নাম কী কখনও মহাভারতের কোনো বীরের নামে হয়! কোনো মুসলমানের নাম কী পার্থ, শান্তনু কিংবা অভিমন্যু হতে পারে? হ্যাঁ পারে, অবশ্যই হতে পারে। একজন মুসলমানের নাম যদি অগ্নি-উপাসক সোহরাব-রুস্তুম-লায়লার নামে হতে পারে, তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের বীরদের নামে নয় কেন? মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ ইন্দেনেশিয়ার সর্বমহলেভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য হিসেবে পঠিত হয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়াতেও পঠিত হয়। ভারতীয় রামায়ণ কিংবা মহাভারত ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও, গ্রন্থ দুটি তারা পরিত্যাগ করেনি।ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের অধিবাসীরাঅধিকাংশই ধর্মে মুসলমান, তারপরও তারা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার স্থপতির নাম আহমদ সুকর্ণ এবং তার কন্যার নাম মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।

তাদের বিমানবন্দরের নাম গারুদা বা গরুড়,গরুড় হল বিষ্ণুর বাহন। ইন্দোনেশিয়ার এক পণ্ডিতের নাম আবদুল্লাহ সরস্বতী। তারা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু ভারতীয় পুরাণের অনুগামী। যেমন আরবরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু প্রাক-ইসলামি যুগের অনেক আচার ত্যাগ করেনি। তাদের প্রিয় কবি ইমরুল কায়েসকেও ত্যাগ করেননি।

বিশ্বের সব সভ্য জাতিই নিজ সত্তারশেকড় খুঁজে পেতে তার ঐতিহ্যর দ্বারস্থ হয় এবং খুব দরদ দিয়েই পূর্বপুরুষদের কৃতী-কীর্তির প্রতি আবেগ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। ইংরেজরা আপস-সমঝোতা ও সংগ্রামের পথ ধরে আধুনিকতা, মানবিকতা ও গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে,শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট করেছেবিজ্ঞানচর্চা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে,কিন্তু রাজতন্ত্রের জৌলুশ-জাঁকজমক, লোকাচার ও অভিজাততন্ত্রের কৌলিন্য ত্যাগ করেনি। তারা অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগকেও নিয়েছে, গ্রিক-রোমান ঐতিহ্যকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ ধ্যানেজ্ঞানে যেমন আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়, তেমনই ঐতিহ্যের কাছেও নতজানু হয়। পূর্বপুরুষদের সৃজনকলারপ্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হয় না। এজন্যই একজনশিক্ষিত জাভানিজ পিতা তারআদরের

পুত্রের নাম রাখেন বীর্যসুপার্থ।

সাংস্কৃতিক কারণেই কাশ্মিরী কায়স্থ ব্রাহ্মণ মোতিলাল নেহেরু তার পুত্রের নাম রেখেছিলেন সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পারসি ভাষায় জওয়াহেরলাল নেহেরু। একই কারণে উত্তর ভারতের কায়স্থহিন্দু খোশবখত রায়ের পুত্রের নাম হয় ইকবাল বখত রায়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি মমতার কারণেই একজন ভারতীয় পার্সি তার পুত্রের নাম রাখেন জাহাঙ্গীর রতনজি দাদাভাই টাটা। মনেপ্রাণে কট্টর মুসলমান হয়েও ইরানিরা ‘নওরোজ’ উৎসব উদযাপন করেনজাঁকজমক সহকারে।নওরোজ কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়, আবার ধর্মবিরোধীও নয়। এটা একটি ঋতুভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক উৎসব। ঐতিহ্যপ্রীতির কারণে কয়েক শোবছর আগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েও আমরা বর্ষবরণ,পৌষ-পার্বণ ও নবান্ন উৎসব উদযাপন করি।ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্য পাঠ করে আনন্দিত হই। চৈতন্যচরিতামৃত কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী বুকের ভেতরে শিহরণ জাগায়। লালন-গগন হরকরার গান শুনে ‘মনের মানুষ’কে খোঁজার চেষ্টা করি। তাদের গানের ভিতর দিয়েই খুঁজে পাই আমাদেরআত্মপরিচয়ের ঠিকানা। তাদের প্রতিভার উজ্জ্বলতা আর ভাষা দিয়েই প্রকাশ করি আমাদের অধ্যাত্মচেতনা, দ্রোহ, প্রেম ও মানবিক আবেগ-সংরাগ। আমরা গর্ব অনুভব করি এই ভেবে যে, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাঙালি ছিলেন।তারা বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন, সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং এ ভাষার জন্য লড়াই করে গেছেন। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পদকর্তারাও বাঙালি ছিলেন। তাদের ধর্মপরিচয় কিংবা বংশলতিকা নিয়ে কী আমরা তেমন মাথা ঘামাই? না, একদম না। যে-ধর্মের অনুসারীই হোন না কেন, তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। আামাদের যত গর্ব ও গৌরব, যত কৃতী ও কীর্তিসবই তো তাদের নিয়ে! তারাই আমাদের শিখিয়েছেন, মানুষ অমৃতের সন্তান। বলেছেন: ‘সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে।’ মানুষ ভজনার বার্তাটি তো লালন ও তার সহগামীদের মাধ্যমেই এ ভূখণ্ডে জারি আছে।

কোনো সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা বা হুজুগ লালনকে ইতিহাসের সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, বংশ জাতপাত, আভিজাত্য, কৌলিন্যের ভিতর মানুষের পরিচয় নেই। মানুষের পরিচয় তার কর্মে, তার কীর্তিতে।মানুষকে কীর্তিমান হতে হলে, তাকে অবশ্যই ইতিহাস, দেশকাল ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এজন্যই লালন বাঙালিত্বের কাছে, ইতিহাসের কাছে, বাংলার ভাবুকতার চরণতলে নতজানু হয়ে বলেছেন: ‘ভাব জানি নে, প্রেম জানি নে/ দাসী হতে চাই চরণে।’ আসলে মানুষ তার জন্মস্থানের দাগ মুছতে পারে না। বদলতেপারে না